সংবাদ

তারিখ ... ... ২১:২:৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ... ৮ কলাম ১ ... ...

0 032

ফেলের হার শতকরা তিরাশি

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বদ হালটা আর একবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ পরীক্ষার সম্প্রতি প্রকাশিত ফলের মধ্য দিয়ে। আট হাজার নয়শ' পঁচিশ জন পরীক্ষার্থীর ভিতর পাস করেছে এক হাজার চারশ' নিরানব্বুই জন। পাসের হার শতকরা সতের। আর চৌদ্দটা কলেজের কেউ পাস করেনি, যার মধ্যে একটা মহিলা কলেজ নিয়ে দু'টো সরকারী কলেজ আছে। প্রথম বিভাগে পাস করতে পারেনি একজনও।

এদেশের বিদ্যাপীঠ, তা বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় যাই হোক না কেন, সেগুলোতে বিদ্যাশিক্ষাদান বা গ্রহণ নামেমাত্রই এমন ফল দেখে এছাড়া ভিন্ন কথা বলার কি কোন অবকাশ থাকে? একশ' জনের মধ্যে সতের জন পাসকে অন্যভাবে বলা যায়, একশ' জনে তিরাশি জন ফেল। তার মানে ফেলের হার শতকরা তিরাশি। চূড়ান্ত পরীক্ষায় এমন পাইকারী ফেলের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন দেশে মিলবে বলে তো মনে হয় না। ছাত্র-ছাত্রীরা যে পরীক্ষার বেড়াটা ডিঙ্গাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ছে পরীক্ষা গ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত ফলাফলের কাগজগুলো তার সংক্ষিপ্ত লিখিত প্রমাণ। বিস্তারিত প্রমাণস্বরূপ উত্তরপত্রগুলো হয়তো পরীক্ষা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের গুদামে মজুত আছে। তবে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। ভাবতে হয়, গলদের কথা। যেখানে শতকরা তিরাশি জন ফেল করে, সেখানে এত ফেলের দোষে দোষী কে বা কারা তাও এপ্রসঙ্গে একটু বোঝার প্রয়োজন আছে। একটা মহলকে দায়ী করা ঠিক হবে না। একের দোষে এত ভয়ানক কাণ্ড কিছুতেই যে ঘটতে পারে না তা জোর গলায় চিল্লিয়ে বলা যায়। শিক্ষার্থী তথা পরীক্ষার্থীরা তাদের দোষের প্রমাণ দিয়েছে উত্তীর্ণদের তালিকার বাইরে থেকে। কিন্তু অন্যরা অর্থাৎ শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট আর যেসব মহল আছেন যেমন বিদ্যাপীঠের শিক্ষক, শিক্ষার ব্যবস্থাপক ও নীতিনির্ধারক সরকার এবং পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থা এই সব তরফের কাউকে কি নির্দোষ বলে বেকসুর খালাস দেয়া যায়? এমনকি যাদের ছেলেমেয়েরা পাসের বদলে ফেল করে গুণোগারির কারণ ঘটায় সেই অভিভাবকদের কি শিক্ষার ময়লা চেহারার জন্য কিছুটা দায়ী করা যায় না?

দোষ অল্পবিস্তর সকল তরফের হলেও মূল অপরাধী বলতে হয়, ব্যবস্থাপক ও নীতিনির্ধারকদেরই। তাঁদের ব্যবস্থাপনার গুণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার পরিবেশ বিদায় নিয়েছে। স্কুল কলেজের ক্লাসে পড়া হয় না, শিক্ষকরা ক্লাসে পড়ানোর বদলে প্রাইভেট পড়িয়ে বেশী রোজগারের দিকে অতিমাত্রায় ঝুঁকছেন। প্রাইভেট টিচার রাখা অথবা নকল করা ছাড়া পরীক্ষা পাসের আশা কম। ব্যবস্থাপক সরকারী কর্তৃপক্ষ যদি এসব খবর না রাখেন তবে তাঁদেরকে মহাশূন্যচারীই তো বলতে হয়। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বছরের তিনশ' পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে দেড়শ' দিনের বেশী কি খোলা থাকে? পরবের ছুটি, দীর্ঘ অবকাশ, হাল আমলের সাপ্তাহিক দু'দিনের ছুটি ছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তি, কর্মচারী, প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী কিংবা পরিচালকমণ্ডলীর কারো আকস্মিক মৃত্যু, বার্ষিক অনুষ্ঠান, মিলাদ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিদায়ীদের ফেয়ারওয়েল প্রভৃতি উপলক্ষ করে যতগুলো দিন খরচ হয় তারপর স্কুল-কলেজের দরজা কয়টা দিনের জন্য খোলা থাকে? এই অবশিষ্ট কালটুকুর মধ্যে প্রাথমিক থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় অবধি পাঠ্য বিষয়ের লম্বা মইয়ের ধাপগুলো কি পার করা শিক্ষক, শিক্ষার্থী কারো পক্ষে সম্ভব? এর ওপর আবার ক্লাশ পড়ানোর ব্যাপারে শিক্ষকদের যেমন আগ্রহ কম, শিক্ষার্থীরা তেমনি অমনোযোগী ও অন্যদিকে উৎসাহী। অন্য বিষয়ে তাদের উৎসাহ সৃষ্টিতেও সরকারের কিছু অবদান সবসময়ে লক্ষ্য করা গেছে। এদেশে যাঁরা যখন ক্ষমতায় এসেছেন তাদের কেউই বিদ্যার্থীদের বিপথগামী করতে কম যাননি। কিছুসংখ্যক বিপথগামীর দরুন শিক্ষাঙ্গনগুলো কখনো রঙ্গমঞ্চ কখনো বা রণক্ষেত্রে যে রূপান্তরিত হয় এবং সকলের লেখাপড়ায় দফারফা হয়ে যায় ক্ষমতাসীনরা তা কখনোই বুঝাবার চেষ্টা করেছেন বলে তো মনে হয় না। করলে শিক্ষাঙ্গনের এত মলিন চেহারা আজ দেখতে হতো না।

অভিভাবকরা ভোগ ও দুর্নীতির কু-দৃষ্টান্তই কেবল নিজেদের ছেলেমেয়েদের উপহার দিয়ে যাচ্ছেন না, ফাঁকি দিয়ে না শিখে পাস করানোর জন্যই সব আয়োজন করে চলেছেন। সুতরাং তাদের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হবে না তো কি হবে? ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে ভর্তি করা আর তাদের জন্য পাসের সার্টিফিকেট পেলেই আজকের বাংলাদেশের অধিকাংশ অভিভাবক সন্তুষ্ট। কিন্তু অবস্থাগতিকে সেই সার্টিফিকেটও এখন হাতে আনা কষ্টকর।

ব্যবস্থাপক ও নীতিনির্ধারকদের কথা বার বারই তুলতে হয়। কারণ অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় শিক্ষাক্ষেত্রেও মূল গায়েন তারাই। গোড়াতে জটিল ও অনাবশ্যক পাঠ্য বিষয়ের ভার চাপিয়ে শিক্ষার ভিতটা তাঁরা এত কমজোর করে রেখেছেন যে, সে ভিতের উপর শক্ত ইমারত গড়া আর সম্ভব নয়। এটা যে অসম্ভব তারই প্রমাণ বি, এ পরীক্ষায় ফেলের হার শতকরা তিরাশি। পরীক্ষায় এমন ফল উচ্চচাপ, নিম্নচাপ সবেরই কারণে। এই হার তিরাশি থেকে একশ'তে পৌঁছালেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এখনো সংশ্লিষ্ট সকলের বোধোদয় না হলে ঐ বিষময় ফল হাতে নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে।